শ্রেণি
(CLASS)

শ্রেণি কাকে বলে?

সহজভাবে বলতে গেলে, শ্রেণি বলতে একই আয় এবং একই রকম সুযোগ সুবিধা ভোগকারী সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝায়। এই গোষ্ঠী শ্রেণি-সচেতন হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সমাজতাত্ত্বিক ওয়েবার শ্রেণির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, শ্রেণি হল কিছু ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত একটি দল যাঁদের জীবনধারণের মান মোটামুটি একই রকমের।

সমাজতাত্ত্বিক ড্রেসলারও মনে করেন, শ্রেণি হল কিছু ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি দল যাদের মোটামুটি একই ধরণের সামাজিক অবস্থান রয়েছে যা আরোপিত নয় বরং অর্জিত এবং যেখানে উর্দ্ধমূখী অথবা নিম্নমূখী সামাজিক গতিশীলতা রয়েছে।

শ্রেণির ধারণা যাঁর লেখায় অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করে তিনি হলেন কার্ল মার্কস। শ্রেণি ধারণা মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রিয় ধারণা। কিন্তু তিনিও সুস্পষ্ট ভাবে শ্রেণির সংজ্ঞা দেননি। তাঁর কাছে শ্রেণি হল অর্থনৈতিক শ্রেণি। মার্কসের মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং এর থেকে উদ্ভূত সম্পর্ক-এ দুটি বিষয় থেকে শ্রেণি ও শ্রেণি সম্পর্ক নির্ণিত হবে।

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার মনে করেন, জনসমষ্টিকে নানা দিক থেকে স্তরবিভাগ করা যেতে পারে। তবে শ্রেণিবিভাগের মধ্যেই স্তরবিভাগের মূল সূত্র নিহিত। যে সকল শ্রেণিকে স্তরবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি উচ্চ নীচ সম্পর্ক ও মর্যাদার তারতম্য থাকবে।

অধ্যাপক জিসবার্ট বলেন, শ্রেণি বলতে সেই সব গোষ্ঠী কে বোঝায় যাদের সমাজে একটি নির্দিষ্ট মর্যাদা আছে এবং যার ভিত্তিতে অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থায়ীভাবে নিধারিত হয়।

বটমোর সামাজিক শ্রেণিকে বাস্তব গোষ্ঠী (de facto group) বলে আখ্যায়িত

Scanned with CamScanner

করেছেন। যদিও সামাজিক শ্রেণির কোনরকম আইনী ভিত্তি নেই (social classes are de facto, but not a dejure group)। তবে বাস্তবজীবনে শ্রেণি ভেদাভেদ বর্তমান।

শ্রেণি আপেক্ষিক অর্থে মুক্ত (open) ব্যবস্থা, এটা কোনো বন্ধ (closed) ব্যবস্থা নয়।

ভারতবর্ষে শ্রেণি কাঠামো (class structure in India)

বর্তমান সময়ের অনেক সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, উত্তরোত্তর ভারতের সমাজে জাত-ব্যবস্থা লোপ পাচ্ছে, তার জায়গায় শ্রেণির উন্মেষ হচ্ছে। তত্ত্বগতভাবে মনে করা হচ্ছে, অর্থনৈতিক প্রগতির দরুণ আধুনিকতার সূচনা হলেই জাত ভেঙ্গে যাবে এবং শ্রেণি পরিচয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে।

ড. রামমনোহর লোহিয়া এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজে শ্রেণি ও জাতি পরস্পরযুক্ত হয়ে অবস্থান করছে। শ্রেণি হচ্ছে গতিশীল জাতি আর জাতি হচ্ছে গতিহীন শ্রেণি।

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতের মতে, ভারতীয় সমাজে মানুষ তাঁর সামাজিক জগতকে শুধুমাত্র জাতি সূচকে (caste-categories) ভাগ করেনা অর্থনৈতিক সূচকেও (economic-categories) বিভাজিত করে। অধ্যাপক বেতেঁর মতে, প্রথম ধরণের সূচক গুলিকে বলা যায় 'সমষ্টিগত ধরণ' (community type) এবং দ্বিতীয় ধরণের সূচকগুলিকে বলা যায় 'শ্রেণি ধরণ' (class type)।

অধ্যাপক ঘনশ্যাম শাহ মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান ভারতে জাতের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই।

সোনলকার এবং সাকের তাঁদের গবেষণা লব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন যে ভারতবর্ষের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির তুলনায় অর্থ নৈতিক ভাবে অগ্রসর অঞ্চলগুলিতে সামাজিক শ্রমবিভাগে জাতের চেয়ে শ্রেণি পরিচয় উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কোনো কোনো মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে ভারতীয় সমাজের পুরোনো সময়ে যে সামাজিক শ্রম বিভাজন ছিল তা জাত ব্যবস্থার অস্তিত্বের পক্ষে উপযোগী কিন্তু পরবর্তী সময়কালে ভারতবর্ষের সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে জাত ব্যবস্থা শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে এবং শ্রেণি ততটাই প্রাসঙ্গিক হচ্ছে। তবে পাশাপাশি একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই, বর্তমানে আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতের গুরুত্বও বাড়ছে।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে এমন কিছু সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয় যা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে লক্ষ্য করা যায়নি। ব্রিটিশ যুগে নতুন আর্থ-সামাজিক-নীতি, নতুন নতুন

Scanned with CamScanner

আইন, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই এই সামাজিক শ্রেণিগুলির উদ্ভব হয়। অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে ব্রিটিশের প্রভাব শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোরই পরিবর্তন করেনি, সামাজিক চেহারাও বদলে দিয়েছিল। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে উত্তরোত্তর ইংরেজ আধিপত্যের ইতিহাসকে একই সঙ্গে প্রাক্- ব্রিটিশ ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিবর্তনের ইতিহাস হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। হতে পারে সেই বিবর্তন ত্রুটিপূর্ণ ও বিকৃত। পুরানো ভূমি সম্পর্কের স্থলে নতুন ভূমি সম্পর্ক, পতনোন্মুখ কারিগরি ও কুটির শিল্পের জায়গায় আধুনিক শিল্পের আবির্ভাব—এ সবই এই পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফলে, প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের পুরানো ভূমি সম্পর্ক ও হস্তচালিত শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিগুলির অস্তিত্ব লোপ পেতে শুরু করল। তার জায়গায় নতুন ভূমি সম্পর্ক ও আধুনিক শিল্পের ভিত্তিতে গঠিত নতুন সামাজিক শ্রেণিগুলির উদ্ভব হতে শুরু করল। ভারতে সব অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন একই সময় শুরু হয়নি। যে অঞ্চল আগে ব্রিটিশ অধিকারে এসেছিল সেখানে নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভবও অপেক্ষাকৃত আগে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পুরো ভারতবর্ষই ব্রিটিশ অধিকারে আসে ফলে জাতীয় স্তরে নতুন সামাজিক শ্রেণিগুলির উদ্ভব ঘটে।

ব্রিটিশ শাসনের আমলে ভারতের গ্রামীণ এলাকায় যে প্রধান সামাজিক শ্রেণিগুলির উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি হল—(১) জমিদার, (২) অনুপস্থিত ভূস্বামী, (৩) প্রজা, (৪) স্বত্ববান কৃষক, (৫) কৃষি মজুর, (৬) মহাজন এবং (৭) বণিক। আর ভারতবর্ষের শহর এলাকাগুলিতে (১) পুঁজিপতি শ্রেণি, (২) শ্রমিক শ্রেণি, (৩) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার শ্রেণি এবং (৪) বিভিন্ন পেশাদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল।

ভারতবর্ষে গ্রামীণ শ্রেণি সমূহ

১। জমিদার শ্রেণি (Zamindar)

ব্রিটিশ সরকার সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি ছিল প্রকৃত অর্থেই জমির মালিক। প্রাক্-ব্রিটিশ আমলেও জমিদার ছিল। তবে তাঁরা ছিল খাজনা আদায়কারী। প্রকৃত অর্থে জমির মালিক নয়। ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার তাগিদেই ব্রিটিশরা জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। ব্রিটিশ অনুগত মিত্রশক্তি হিসেবে জমিদার শ্রেণি মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই তাদের ভূমিকা পালন করেছিল। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে জমিদাররা ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে কোনো রকম উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করেনি। অধিকাংশ জমিদারই ছিল রক্ষণশীল। আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থাই তাদের কাম্য ছিল। অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, এর কারণ হল এই যে জমিদারী অভিজাত সম্প্রদায় আশঙ্কা করেছিল যে অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যে কোনো ধরনের জন-গণতান্ত্রিক রূপান্তর তাঁদের স্বার্থ, এমনকি অস্তিত্বও বিপন্ন করবে।

Scanned with CamScanner

লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করে ভারতবর্ষের প্রথম প্রকৃত অর্থে জমিদারি প্রথা চালু করলেন। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সূচনা হলো। নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মতে, জমিদাররা হল লর্ড কর্ণওয়ালিসের তৈরি অভিজাত শ্রেণি। এঁরা সম্পূর্ণভাবেই রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট। অধিকাংশ ব্রিটিশ প্রশাসক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে জমিদারি ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। লর্ড বেন্টিকের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে তবে একটা ব্যাপারে তা সফল। ব্যাপক সংঘর্ষ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অভাব হলে ঐশ্বর্যবান জমিদাররা থাকবে যারা ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বে আগ্রহী।

২। অনুপস্থিত ভূস্বামী শ্রেণি (Absentee land lords)

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি ছাড়াও পরবর্তী সময়ে আর এক ধরনের ভূস্বামী শ্রেণির উদ্ভব হল। এই নতুন অনুপস্থিত ভূস্বামীরা জমির মালিক হলেও জমির পরিচর্যা করত না। তারা কৃষিতে কারিগরিগত কোনো ধরনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়নি। গ্রামের বাইরেই অধিকাংশ সময় বসবাস করত। এরা শুধুমাত্র তাদের মালিকানাধীন কৃষিজমির খাজনা আদায় করতে উৎসাহী ছিল। ব্রিটিশ আমলে জমি কেনা-বেচা করা, মজুর ভাড়া ও নিযুক্ত করার অধিকার দেওয়া শুরু হল। এর ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা অনুপস্থিত ভূস্বামী শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছিল।

৩। জমিদার ও অনুপস্থিত ভূস্বামীদের অধীনে প্রজাগন (Tenants)

ব্রিটিশ যুগে জমিদারি ব্যবস্থা পত্তনের সাথে সাথে ভারতবর্ষে প্রজা শ্রেণির সৃষ্টি হল। জমিদারি এলাকার প্রজা ছাড়া রায়তওয়ারী এলাকাতেও এক নতুন ধরনের প্রজা শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। জমি ইজারা দেওয়ার অধিকারের স্বীকৃতির ফলেই প্রজা শ্রেণির সৃষ্টি হয়। নির্বিচারে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হত। খাজনার বোঝায় ভারগ্রস্ত প্রজাদের জীবন ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে উঠতে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য নানা ধরনের শোষণে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে থাকে। উত্তরোত্তর তাদের দারিদ্র্য ও ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পায়। কালক্রমে অনেক মধ্যবর্তী শ্রেণির উদ্ভব হলো। এর ফলে প্রজাদের ওপর না না পর্যায়ে শোষণের মাত্রাও বাড়তে লাগল। তাঁদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটল।

চাষবাসকারী প্রজাদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৮৫৭ ও ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন চালু হল। এতেও প্রজাদের জীবনমান প্রায় একই রকম থেকে গেল। প্রজা সমিতি গড়ে তুলে এই অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ মুখর হল। শ্রেণি চাহিদা নিয়েই তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করল।

৪। স্বত্ববান কৃষক শ্রেণি (Peasant Proprietors)

রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমিতে সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ শাসিত ভারতে স্বত্ববান কৃষক শ্রেণি সৃষ্টি করেছিল। আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে এরা তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত

Scanned with CamScanner

ছিল—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের কৃষক। স্বত্ববান কৃষকরা সরাসরি সরকারকে খাজনা দিত। সরকারের সঙ্গেই তাঁদের সরাসরি কাজকর্ম চলত। অন্যদিকে প্রজারা (Tenants) খাজনা দিত জমিদারকে, সরাসরি সরকারকে নয়।

অল্প কিছু স্বত্ববান কৃষক ধনী কৃষকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে চাষবাসকারী অধিকাংশ স্বত্ববান কৃষক অত্যাধিক খাজনার চাপ, জমির খণ্ডীকরণ, ঋণগ্রস্ততা প্রভৃতি কারণে ক্ষেতমজুরে রূপান্তরিত হচ্ছিল। তাদের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জমি তাদের হাত থেকে দ্রুত মহাজন, বণিক ও অন্যান্যদের হাতে চলে যেতে থাকল। তবে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্বত্ববান কৃষকদের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ এ. আর. দেশাই এই কৃষক শ্রেণিকে তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, যত কমই হোক না কেন স্বত্ববান কৃষকরা যেহেতু জমির মালিক তাই সাধারণভাবে তাঁরা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করত।

৫। কৃষি মজুর শ্রেণি (Agricultural Labourer Class)

ব্রিটিশ আমলে ভূ-সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা, মজুর ভাড়া ও নিযুক্ত করার অধিকার মালিককে দেওয়া হল। এর ফলে একদিকে অনুপস্থিত ভূস্বামী শ্রেণির সৃষ্টি হল। আবার অন্যদিকে, কৃষি মজুর শ্রেণির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অসম প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে মধ্য ও নিম্ন পর্যায়ের স্বত্ববান কৃষকের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। কৃষি জমি মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণির কুক্ষিগত হতে লাগত। অধিকাংশ স্বত্ববান কৃষক কৃষি মজুরে পরিণত হলো। কৃষকদের আর্থিক অসহায়তাকে মহাজনেরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সুদের হার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হলেও সব জায়গাতেই তা ছিল খুব বেশি। অধ্যাপক এ. আর দেশাইয়ের মতে দারিদ্র্যের জন্যই কৃষকের ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার ঋণগ্রস্ততার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দারিদ্র্য তরান্বিত করল। এ ছিল এক বিষচক্র। এরই ফলে গরীব কৃষক মহাজনের কাছে শুধু ফসল নয়, দ্রুত জমিও হারাচ্ছিল। জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদের এই প্রক্রিয়া সর্বহারা ক্ষেতমজুর শ্রেণির বিস্তার ঘটাচ্ছিল।

৬। মহাজন শ্রেণি (Money Lender Class)

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রামাঞ্চলে 'মহাজন' শ্রেণি ছিল। তবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের মহাজন শ্রেণি থেকে তা ছিল অনেকাংশেই আলাদা। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে মহাজনরা গ্রাম-পঞ্চায়েত নির্দেশিত হারে প্রয়োজনে কৃষক ও কারিগরকে ঋণ দিত। তবে সে সময় মুদ্রার প্রচলন খুবই কম ছিল। সেই কারণে ঋণের প্রচলনও ছিল কম। ঋণ অনাদায়ী হলেও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের মহাজনরা জমি অধিকার করে নিতে পারত না। কেননা তখন জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো না। ব্রিটিশ আমলে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা চালু হলো। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হল। এসবের ফলে মহাজনদের ভূমিকা ও ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্র'র মতে, ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে মহাজন শ্রেণির উদ্ভবই হলো

Scanned with CamScanner

ব্রিটিশ নীতির সবচেয়ে অশুভ ফল। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই শ্রেণির প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারত। এই শ্রেণি ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজে কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে নিয়েছিল। স্যর ডানিয়েল হ্যামিলটন এর মতে, 'মহাজনদের করতলগত' ঋণের বন্ধনই কৃষিকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। রায়তদের অসীম দারিদ্র্যের কারণ মহাজনের ক্ষমাহীন সুদ।

ম্যালকম ডার্লিং-এর মতে, মহাজনকে দোষারোপ না করে যে সমাজব্যবস্থা মহাজন সৃষ্টি করেছে তাকেই দোষারোপ করা উচিত। এম. আজিজুল হক ডার্লিং-এর বক্তব্যকে বহুলাংশে সত্য বলে মনে করেন। তবে তাঁর মতে, একথা আরো সত্য যে, অর্থনীতি বা মানবিকতার কোনো মানদণ্ডেই মহাজনের নির্যাতনমূলক সুদের সমর্থন করা যায় না।

৭। বণিক শ্রেণি (Merchant Class)

অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, ব্রিটিশ শাসনকালে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে বণিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষের বণিকদের থেকে তারা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রাম সমাজে যে সব দ্রব্য উৎপাদিত হত না তখনকার বণিকরা সেগুলির যোগান দিত। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে সব ধরনের উৎপাদনই হত বাজারের জন্য। প্রাক্-ব্রিটিশ আমলের মতো শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন হত না। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাজার বিস্তার লাভ করল। বাজারে সাথে যুক্ত এক আধুনিক বণিক শ্রেণির উদ্ভব হল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতেও আভ্যন্তরীণ ও বর্হিবাণিজ্য ছিল। কিন্তু, তার পরিধি ছিল খুবই সীমিত। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ বাজার অনেক বিস্তৃত হল। এছাড়াও তা অনেক ব্যাপকভাবে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত হল। নতুন বণিক শ্রেণি আরও বেশি করে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় লিপ্ত হল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করে তাঁদের কাছে মুনাফা অর্জনের বিরাট সুযোগ উপস্থিত হল। এই ভাবেই ভারতবর্ষে বণিক শ্রেণির মধ্যে বাণিজ্যিক বুর্জোয়া বা ধনিক শ্রেণির উত্থান সূচিত হল।

স্বাধীন ভারতবর্ষে কৃষি সম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামো (Agrarian class structure in Independent India)

ভারতবর্ষের গ্রামীন শ্রেণি কাঠামো অনেকাংশে ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রামীন সমাজে আয়, ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি নির্ধারণ করে তার মধ্যে ভূমি ব্যবস্থাই প্রধান। গ্রামীন সমাজে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের মূল দুর্বলতা নিহিত আছে বিশেষত জমির অসম বন্টনের মধ্যেই। বর্তমানে মোটামুটি আড়াই শতাংশ জমির মালিক দেশের তেইশ শতাংশ চাষ-যোগ্য জমির মালিকানা ভোগ করছে। বিগত বছর গুলিতে কৃষি মজুরের সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়ে যাওয়া থেকে বোঝা যায় যে কৃষকদের নীচের স্তরগুলি ক্রমশ জমি হারাচ্ছে এবং জমির কেন্দ্রীভবন বাড়ছে।

Scanned with CamScanner

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে ভারতীয় গ্রামীন সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ভূমি সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আইন-বিশেষ করে মধ্যস্বত্ব বিলোপ এবং জমির উর্ধসীমা নিয়ন্ত্রণ আইন গ্রামীন শ্রেনি কাঠামায় প্রভাব ফেলেছে। ভূমি সংস্কারের ফলে গ্রামভারতের শ্রেণি শাসনের চরিত্র বেশ কিছুটা পাল্টায়। সামন্তরাজ, অনুপস্থিত জমিদারের স্থানে আসে বড়ো জোতদার। এই নতুন শ্রেণির জমির মালিকরা সাধারণত গ্রামে থেকেই চাষবাস দেখা শোনা করতে থাকে।

কৃষিসম্পদে, বিশেষত ভূসম্পত্তিতে, নিম্নবর্ণের মানুষের দখল অনেক কম। এর ফলে গ্রামীন শ্রেণি কাঠামোয় তাঁরা ক্রমশই প্রান্তিকতায় গিয়ে পড়েছে। এরাই গ্রামীন সমাজের ভূমিহীনদের একটা বড় অংশ। এঁদের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হয়ে শহরাঞ্চলে চলে যায় কাজ পাওয়ার আশায়। শহরাঞ্চলে বিশাল পরিমান অসংগঠিত মজুত শ্রমের অনুপাত আরও বৃদ্ধি পায়। মজুরী নিয়ে দরাদরির কোনো ক্ষমতাই থাকে না এদের। শোষনের মুখে একেবারে প্রতিরক্ষাহীনভাবে দিন কাটায়।

অধ্যাপক পরমজিৎ জাজের মতে, স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে বৃহৎ ভূস্বামী, প্রাক্তন জায়গীরদার ও সামন্তরাজরা জমিদারী উচ্ছেদ আইনে জমি হারালেও নানা উপায়ে তাঁরা জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি, তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়ে ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রে এক গুরুত্বপুর্ণ শক্তি হিসেবে ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইনগুলির বাস্তব প্রয়োগে তেমন কোনো রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখা যায় না।

কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানীর মতে, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের ভারতবর্ষে গ্রামীণ সমাজে প্রথাগত প্রজাস্বত্ব (customary tenancy) ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটতে শুরু করে। তার বদলে আরো বেশি শোষণমূলক এবং নিরাপত্তাহীন ইজারা বা পাট্টা (lease) ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এর ফলে গ্রামভারতে ব্যবসায়িক মানসিকতা সম্পন্ন এক নতুন ধনী কৃষক (Rich peasant) শ্রেণির উদ্ভব হয়। বাণিজ্যিক ভাবে কৃষি কাজ চালানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি (resource) এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ (enterprise) এই শ্রেণির ছিল।

আঁদ্রে বেতে তাঁর 'ক্লাস স্ট্রাকচার ইন অ্যান অ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি' নামক রচনায় গ্রাম সমাজের জোতদার শ্রেণির উত্তরোত্তর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রভাবশালী জাতই ধীরে ধীরে জোতদার শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রামীন শ্রেণিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া কোনো নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পারেনি। এক্ষেত্রে শ্রেণি কাঠামোও স্পষ্ট নয়। বেঁতে এই অবস্থাকে বলেছেন নিরাকার (amorphous) অবস্থা।

কোলেন্দা (Pauline Kolenda) অবশ্য তামিলনাড়ুতে করা তাঁর সমীক্ষার ভিত্তিতে মনে করেন গ্রামীন জাত-ব্যবস্থা থেকে শ্রেণি ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়া তখন অনেকটাই স্পষ্ট। তবে এই রূপান্তর ধনী শ্রেণিতে নয় মধ্যশ্রেণিতে।

Scanned with CamScanner

গুজরাটের সুরাট জেলায় করা এক সমীক্ষার ভিত্তিতে জন ব্রেমান মন্তব্য করেছেন যে কৃষি সম্পর্কিত সরকারি কর্মসূচি কৃষি শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং তাঁদের দরিদ্রতর করেছে। সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব, বিদ্যুৎ এবং সেচ প্রকল্প মূলত ধনী কৃষকদের স্বার্থেই লেগেছে। বৃহৎ জমির মালিকরাই সরকারি গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পেয়েছে। গরীব প্রান্তিক চাষি এর থেকে তেমন কোনো সুবিধা লাভ করতে পারেনি। বরং এই অসম অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পেরে সামান্য জমি-জমা বিক্রি করে দিয়ে তারা কাজের খোঁজে শহর মুখী হয়েছে। ব্রেমানের মতে, এই ভাবেই ভারতবর্ষের কৃষিতে পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ভারতবর্ষে গ্রামীন শ্রেণিব্যবস্থা মার্কসীয় ও ওয়েবারীয় উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিশ্লেষন করা সম্ভব। কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন শুধুমাত্র মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতবর্ষের গ্রামীন শ্রেণিকে বিশ্লেষণ করার কাজটা খুব সফল ভাবে করা সম্ভব নয়। কারণ ভারতবর্ষের গ্রামীন সমাজব্যবস্থায় জাত ও শ্রেণি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

এ প্রসঙ্গে গেল ওমভেটের মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। ওমভেটের মতে, ভারতবর্ষের জাত ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান খুব স্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। সেই কারণে আগেকার জমিদার এবং জায়গিরদাররা পুঁজিবাদী কৃষকে (capitalist peasants) এ পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ আগেকার উঁচু জাতই বর্তমানের উঁচু শ্রেণি।

উঁচু প্রভাবশালী জাত অনেকক্ষেত্রেই উঁচু শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে বলে কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিকের অভিমত কে.এল. শর্মার পর্যবেক্ষণের সাথে পুরোপুরি মেলেনা। সমীক্ষালব্ধ নতুন তথ্য উপস্থাপন করে অধ্যাপক শর্মা দেখিয়েছেন যে বর্তমান গ্রামীন সমাজে আধিপত্যকারী জাতের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক কমেছে। নতুন নতুন গ্রামীণ ক্ষমতা কেন্দ্রের উদ্ভবে আধিপত্যকারী জাতের প্রাসঙ্গিকতা এখনকার সময়ে খুবই কম।

অন্যদিকে, নতুন নতুন আইনসিদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরাও বর্তমানে গ্রামীন ক্ষমতা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত। দরিদ্র শ্রেণির মানুষের এই ক্ষমতায়ন গ্রামের ঐতিহ্যবাহী উচ্চবর্গীয় ক্ষমতাবানদের (power-elites) কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করিয়েছে।

অধ্যাপক কে. এল. শর্মার মতে, বর্তমান ভারতীয় সমাজে জাত এবং শ্রেণি উভয়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের শক্তিশালী উপায়ে পর্যবসিত হয়েছে। একবার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে পারলে তাদের শ্রেণি অবস্থানকে আরও সংহত ও শক্তিশালী করার কাজে তা পুনরায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ কথা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সবুজ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে অর্থাৎ রাসায়নিক সার উচ্চ ফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদির সাথে চাষবাসে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এই দেশের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পদ্ধতি ফলপ্রসুভাবে ব্যবহার করতে শুরু করল বৃহৎ চাষিরা যাঁরা এর জন্য অর্থনৈতিকভাবেও সক্ষম ছিল। ভারতবর্ষের কৃষি

Scanned with CamScanner

উৎপাদনে এই পুজিঁবাদী ব্যবস্থার প্রয়োগ এক্ষেত্রে শ্রেণির উদ্ভবকেও তরান্বিত করল।

অধ্যাপক কে, এল, শর্মার মতে, কৃষিতে নতুন পুজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি গ্রাম ভারতের শ্রেণি কাঠামোকে ধনী-দরিদ্র, প্রভাবশালী-দুর্বল, উঁচু-নীচু শ্রেণিতে বিভক্ত করলো। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিগুলির সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসেবে রাষ্ট্রের সঙ্গে এই শ্রেণির সম্পর্কও নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়। তিনি রাজস্থানের ছয়টি গ্রামের সমীক্ষা লব্ধ তথ্য বিশ্লেষন করে দেখান এর ফলে নতুন ধনী কৃষক সম্প্রদায় আর্থিক দিকে শক্তিশালী হয়ে গ্রামীন সমাজে নতুন পুঁজিপতি শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্য দিকে, কোনো কোনো গ্রামে কৃষি মজুর শ্রেণির সঙ্গে কিছু প্রাক্তন ভূস্বামীও তাঁদের চিরাচরিত সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে নিম্ন শ্রেনিভুক্ত হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জিও তাঁর 'ডায়নামিকস্ অব রুরাল সোসাইটি' গ্রন্থে প্রায় একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজতাত্ত্বিকরা ভারতবর্ষের কৃষিসম্বন্ধীয় শ্রেণি কাঠামো বিষয়ে ক্ষেত্রগবেষনা করতে গিয়ে মূলত দুই ধরণের সামাজিক সচলতার ধারা প্রত্যক্ষ করেছেন। একদিকে মধ্যবর্তী কৃষক শ্রেণি (intermediate class peasantry) উর্দ্ধাভিমুখী সামাজিক সচলতার মধ্য দিয়ে উচ্চ শ্রেণির ধনী কৃষকে পর্যবসিত হয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (small and marginal peasants) নিম্নাভিমুখী সামাজিক সচলতার মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষি মজুরে পরিনত হয়েছে।

অধ্যাপক টি.কে উমেন (T.K.Oommen) কে অনুসরণ করে আমরা ভারতবর্ষের গ্রাম সমাজের কৃষি সম্বন্ধীয় শ্রেণিসমূহের নিম্নলিখিত তালিকা তৈরি করতে পারি—

(১) ভূস্বামী (landlords) -এঁরা জমির মালিক কিন্তু জমি চাষাবাদের সাথে যুক্ত নন। হয় তাঁরা এজন্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের কাউকে নিযুক্ত করে অথবা জমিচাষের জন্য লিজ দিয়ে দেয়। কারো কারো মতে, এই শ্রেণি একই সাথে সামন্ততান্ত্রিক এবং পুঁজিপতি ধরণের যাঁরা কোনো কায়িক পরিশ্রম করে না।

(২) ধনী কৃষক (rich peasants) -এঁরা কৃষিকাজকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। বাজারের জন্য শস্য উৎপাদন করে, এঁদের শস্য নির্বাচন এবং উৎপাদনের পরিমান নির্ধারণের পেছনে মূল লক্ষ্য থাকে লাভ (profit)। এই শ্রেণি চাষের কাজে কৃষিমজুর নিয়োগ করে এবং নিজেরা চাষ না করে চাষের তদারকির কাজেই যুক্ত থাকে।

(৩) মধ্য কৃষক (middle peasants)— যাঁরা নিজেরাই নিজেদের জমি চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তবে বীজ পোতা বা ফসল কাটার সময় গুলিতে কৃষি মজুর নিয়োগ করে। এঁদের নিজেদের মালিকানার জমির সাথে লিজেও জমি নেয় যা এঁরা মূলত পরিবার গতভাবেই চাষাবাদ করে।

(৪) গরীব কৃষক (poor peasants) —এঁরা ছোট মাপের জমির মালিক যে জমিতে চাষাবাদ অর্থনৈতিক ভাবে খুব লাভজনক হয় না। তার ফলে এঁদের অন্যের মালিকানাধীন

Scanned with CamScanner

জমিতেও আংশিক সময়ের মজুরের কাজ গ্রহণ করতে হয়। সে ভাগচাষিও (sharecropper) হতে পারে। এঁরা নিজেদের চাষের কাজে সাধারণত কোনো মজুর নিয়োগ করেনা।

(৫) ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক (landless agricultural workers) —এঁরা কৃষি এবং কৃষিভিত্তিক কাজে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে জীবীকা নির্বাহ করে। কাজ ও মজুরীর জন্য ভূস্বামী, ধনী কৃষক এবং মধ্য কৃষক এই তিন শ্রেণির ওপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয়।

ভারতে শহুরে শ্রেনি কাঠামো (Urban class structure in India)

১। পুঁজিপতি শ্রেণি (Capitalist Class)

ব্রিটিশ যুগে ভারতবর্ষে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রচলন হল। কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ হলো। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হল। রেলপথ স্থাপিত হল। এই সবেরই সামগ্রিক ফল হিসেবে জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী শ্রেণির কাছে মুনাফা অর্জনের বিরাট সুযোগ এল। এই মুনাফারই একটি অংশ কাজে লাগিয়ে ভারতীয় মালিকনায় সূতাকল, খনি এবং অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা হল। এরই ফলে ভারতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব হলো। মিল মালিক, খনি মালিক এবং অন্যান্য নতুন শিল্প উদ্যোগের মালিকরা নতুন পুঁজিপতিশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পরিচিত হল।

অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের মতে, ভারতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল ১৮৫৮ সালের পর। অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতায় নামতে হল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে যে কোনো ধরনের দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার প্রতি আমলাদের বিদ্বেষভাবাপন্ন মনোভাব ছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গে বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়েছিল ভারতের নতুন পুঁজিপতিদের। এ জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল সরকারের সক্রিয় সাহায্য। উল্টো ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থপর নীতি তাঁদের শিল্পোদ্যোগের অন্তরায় হয়ে দাড়াল। তারা অনুভব করল ব্রিটিশ সরকারের নীতি প্রকৃত অর্থেই তাদের স্বার্থবিরোধী। যতদিন এরা ভারতবর্ষ শাসন করবে ততদিন ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের সত্যিকারের অগ্রগতি সম্ভব নয়। যদিও ব্যবসায়িক কারণেই তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাত এড়িয়ে চলত। প্রধানত আর্থিক সাহায্য দিয়ে দেশীয় শিল্পপতিরা জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করল।

২। শ্রমিক শ্রেণি (Working Class)

আধুনিক শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। তা হল শ্রমিক শ্রেণি। অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের মতে, সেই সময়কার ভারতবর্ষে এই শ্রেণি ছিল এক নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি। যদিও তাঁরা সংখ্যায় ছিল খুব কম, তৎকালীন ভারতীয় জনসমষ্টির এক ক্ষুদ্র অংশ। পুঁজিপতি শ্রেণির

Scanned with CamScanner

মতো এই শ্রেণির স্বার্থবোধের চরিত্রও অনেক ক্ষেত্রেই ছিল সর্বভারতীয়। বস্ত্র, পাট, খনি, যানবাহন, বাগিচা ইত্যাদি শিল্পের সঙ্গে এঁরা যুক্ত ছিল। প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে এই ধরনের শিল্প ছিল না তার ফলে, সে সময়ে এইসব শিল্পের সাথে যুক্ত কোন শ্রমিক শ্রেণির অস্তিত্বও ছিল না। অধ্যাপক এ. আর. দেশাই-এর মতে, মূলত দরিদ্র কৃষক ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হস্তশিল্পী যারা মজুর হয়েছিল তাদের মধ্য থেকেই ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণি প্রধানত গঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ লেখকই ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাপন ও কাজের শর্তের নীচু মানের কথা স্বীকার করেছেন। এস. ভি. পারুলেকার ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শ্রমিকদের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে বিপুল গরিষ্ঠ শ্রমিকই এমন মজুরি পেত যা দিয়ে জীবনের ন্যুনতম প্রয়োজনগুলিও মেটানো সম্ভব হয়নি। তাঁরা অসুস্থতা, বেকারীত্ব, বার্ধক্য ও মৃত্যুর বিপদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতো। তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তার কোনো রকম ব্যবস্থা ছিল না। যদিও ত্রিশের দশকে শ্রমিক কল্যাণের স্বার্থে ক্ষতিপূরণ আইন, ফ্যাকটরি আইন, খনি অইন প্রভৃতি কতকগুলি আইন রচিত হয়। অনেকেই ব্রিটিশ সরকারের এই আইনগুলিকে শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় আদৌ যথেষ্ট বলে মনে করতেন না।

হুইটলি কমিশনের মতে, বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত বেশিরভাগ শ্রমিক পরিবারগুলির দুই-তৃতীয়াংশই ঋণভারে জর্জরিত ছিল। মজুরি ছিল খুবই কম। জীবনযাত্রা ছিল খুবই নিম্নমানের। তাঁরা অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। জাত ও সম্প্রদায়গত বিভেদের শিকার। শ্রমিকদের বেশিরভাগই ছিল কুসংস্কার ও নিয়তিবাদে বিশ্বাসী। অধ্যাপক জুর্গেন কুজিয়াস্কি ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন, তাঁর মতে, ভারতীয় শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় আহার জোটে না। আলো-বাতাসহীন ছোট্ট ঘরে তাকে পশুর মতো বাস করতে হয়। ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সবচেয়ে শোষিত মানুষের মধ্যে সে একজন।

৩। **ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার শ্রেণি (Petty Traders & Shop keepers)**

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শহর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদার শ্রেণির উদ্ভব হয়। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে এরা জড়িত ছিল।

৪। **বিভিন্ন পেশাদার শ্রেণি (Professional Classes)**

ব্রিটিশ শাসনের ফলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যোগাযোগ ঘটে। পশ্চিম ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারার ঢেউ ভারতেও এসে পৌঁছয়। ব্রিটিশ শাসকেরা এই চিন্তাধারাকে ভারতীয় সমাজের উপযোগী তাৎপর্য দান করল। ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থে একে ব্যবহার করতে শুরু করল। ভারতে আধুনিক পেশাদার শ্রেণিগুলির উদ্ভবের অন্যতম কারণ ছিল ব্রিটিশ শাসনকালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার। প্রকৌশলী, ডাক্তার, আইনজীবী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, ম্যানেজার, কেরানী প্রভৃতি বৃত্তিভোগীদের নিয়েই গড়ে উঠেছি...

Scanned with CamScanner

বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, নতুন বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনের তাগিদই ব্রিটিশ সরকারকে উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এইভাবে ভারতে নতুন নতুন পেশাদার শ্রেণির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। এরা ব্রিটিশ আমলে ভারতে গড়ে ওঠা নতুন পুঁজিবাদী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল।

বর্তমান ভারতবর্ষে শহুরে শ্রেনি (Urban class in India today) —

ভারতবর্ষের শহর বা নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন এবং বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রে এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা খুব সহজ নয়। তবে এই বিষয়ে সকলেই একমত যে ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে আর্থিক বৈষম্য বৃধ্বি পেয়েছে। সম্পদশালী শ্রেণি ও সম্পদহীন শ্রেণির মধ্যে ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃধ্বি পাচ্ছে।

সম্পদশালী এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণিসমূহ অধিকতর সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, আপেক্ষিক স্বাধীকারও এই শ্রেণির অনেক বেশি।

অন্যদিকে, সম্পদহীন নিম্নবর্গের শ্রেণির অধিকাংশ মানুষই অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে বা অন্য কোন অকৃষিগত কাজে যুক্ত। অনেক ক্ষেত্রেই এরা শ্রমিক মজদুর সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকলেও ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের আন্দোলনে শ্রেণি হিসেবে এঁদের উপস্থিতি খুব স্পষ্ট নয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে তিনটি শ্রেণির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়—উচ্চ শ্রেণি, মধ্যম শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি। শহরাঞ্চলের শ্রেণি মুলত সম্পদ ও পেশার ভিত্তিতে তৈরি হয়।

একটু গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলের শ্রেনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভাজন করা যায়—

১। **পুঁজিপতি শ্রেণি (capitalist class)** — উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা এই শ্রেণির বৈশিষ্ট্য। এই ধনতান্ত্রিক শ্রেণিকে সাধারণত শহর বা নগরাঞ্চলেই দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা সাধারণত বিলাসিতার মধ্যে জীবনযাপন করে। এঁদের হাতে বড় বড় শিল্প কারখানা থাকে। মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় এই শ্রেণির সুযোগ সম্ভাবনা বৃধ্বি পায়। দেশের আর্থিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে ব্যাংক ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী এই শ্রেণি। দেশের জাতীয় আয়ের এক বৃহৎ অংশ এদের হাতে থাকে যদিও এই শ্রেণির জনসংখ্যা অনেক কম। এই শ্রেণি স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চ বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

২। **উদ্যোগপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণি (Entrepreneur and Business class)**

উদ্যোগপতিদের উপস্থিতি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-সব ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। ধনী কৃষকদের অতিরিক্ত উপার্জন অনেক সময় উদ্যোগপতি তৈরি করে, এই অতিরিক্ত অর্থ তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্যে

Scanned with CamScanner

বিনিয়োগ করে।

ছোটো বড় ব্যবসায়ী, দোকানদার এমনকি মধ্যবর্তী পর্যায়ের দালালদের ব্যবসায়ী- শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই শ্রেণি উৎপাদক এবং উপভোক্তাদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করে।

৩। **মধ্যবিত্ত শ্রেণি (middle class)**— আধুনিক শহুরে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিসর অনেক ব্যাপক। অনেকে আবার আলোচনার সুবিধার জন্য এই শ্রেণিকে আরও নির্দিষ্টভাবে উচ্চ মধ্যবিত্ত (upper middle class) এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত (lower middle class) এই দুই ভাগে ভাগ করেন। সরকার এবং শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত আমলারা, সংগঠিত ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার, উচ্চপদস্থ আধিকারিক, সাদা কলার (white collar) কর্মি, সব স্তরের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, দক্ষকর্মী এবং আরও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত পেশাদার ব্যক্তিদের এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভারতবর্ষের শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি পুজিঁবাদ, শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে উদ্ভূত হয়েছে একথা বলা যায়। কেউ কেউ এই শ্রেণির মধ্যে শিক্ষক, অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, লেখক, বিজ্ঞানী, উকিল, সমাজ কর্মি প্রমুখকে আবার পৃথক ভাবে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির (Intellectual class) অর্ন্তভুক্ত করে থাকে।

৪। **শ্রমিক শ্রেণি (working class)**— জনসংখ্যাগত হিসাবে এই শ্রেণিই শহর বা নগরাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শ্রেণি। শ্রমিক শ্রেণিকে মূলত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। একটা অংশ যাঁদের শ্রমশক্তির বিনিময় মূল্য বেশি। এঁদের কখনো কখনো দক্ষ কর্মী হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। জীবনযাত্রার দিক থেকে এঁরা মোটামুটি স্বচ্ছল। এঁরা মূলত সংগঠিত শিল্পসংস্থার কর্মী।

অন্য অংশ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্যাতিত শ্রমিক। কঠোর শারিরীক শ্রমের মাধ্যমেই এরা জীবীকা নির্বাহ করে। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার কারণে এঁরা অনেক অধিক মাত্রায় শোষিত হয়। এই শ্রেণিকে অনেকে কায়িক পরিশ্রমে যুক্ত শ্রমিক বা লেবারার ক্লাস (labourer class) হিসেবেও অভিহিত করে। এঁরা শ্রমিক আন্দোলনে অনেক বেশি যুক্ত থাকে। জীবন জীবীকার স্বার্থে এই শ্রেণির মানুষের আন্দোলন করতে হয়। ভারতবর্ষের এই ধরনের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জাত-পাত, ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বিভাজনও পরিলক্ষিত হয় যা ভারতবর্ষে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন সংঘটিত করার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যেই এই ধরণের সমস্যা অনেক বেশি দেখা যায়। তবে স্বাধীন ভারতবর্ষে শ্রমিক কল্যানে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণভাবে শ্রমিকদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তি গত প্রভাব এদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এনেছে।

Scanned with CamScanner